ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ৭৯-৯৬
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4305

যশোরের চারু ও কারুশিল্প এবং প্রবাদ-প্রবচন

ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

Abstract: Folk culture forms an integral part of Bangladesh's rich cultural heritage, representing the creative spirit and identity of its people. Over generations, traditional arts and crafts have evolved through age-old folk practices, employing indigenous motifs that reflect the land, its environment, and its communities. These handicrafts, produced to fulfill religious, social, and aesthetic needs, embody both collective creativity and cultural continuity. The folk art of Jessore particularly illustrates the lifestyle, beliefs, and traditions of its rural population, while also expressing the emotions, aspirations, and artistry of rural women. As one of the historically and culturally significant districts in the south-western region of Bangladesh, Jessore holds an important place in Bengal's socio-economic, religious, and artistic history. Its diverse traditions—*patachitra*, *nakshi kantha*, *nakshi pakha*, *nakshi shika*, bamboo and cane crafts, *shola* art, pottery, and terracotta—demonstrate distinctive regional characteristics. Equally important are Jessore's folk sayings and proverbs, which encapsulate communal wisdom and moral values derived from lived experiences. These expressions remain prevalent, serving as vital elements of local oral literature. However, this traditional aesthetic excellence is increasingly endangered by modernization, urbanization, and industrialization. The present study seeks to examine the distinctive features, development, and transformation of Jessore's folk arts, crafts, sayings, and proverbs, emphasizing their enduring cultural significance and the necessity of preservation in the face of changing socio-cultural realities.

Key Words: Jessore, Fine art, Handicraft, Folk saying and proverb, Tradition.

ভূমিকা

কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত শক্তির মূল অভিব্যক্তির পরিচয় মেলে তার লোকসংস্কৃতিতে। লোকসংস্কৃতি বা চারু-কারুশিল্প হলো লোকসমাজের অভিব্যক্তি, যে অভিব্যক্তির মধ্যে তার মানসিক চেতনা, অনুভূতি ও দর্শনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সমাজে বিদ্যমান ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতিকে ধারণ করে এটা গড়ে ওঠে। মানুষের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ, মননশীলতা ও ধ্যান-দর্শন লোকসংস্কৃতি বহন করে চলে। ঐতিহ্যই হলো লোকসংস্কৃতির প্রাণশক্তি। যশোরের চারু ও কারুশিল্প এবং প্রবাদ-প্রবচন সেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর চিন্তন, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের ঐতিহ্যিক লোকচরিত্রের পরিচায়ক। পরিবর্তনশীল সমাজ পটভূমিতে

ঐতিহ্যময় সাহিত্য, শিল্প, দেবধারণা, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি তথা চারু ও কারুশিল্পের উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এসব উপাদানে যশোরের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মনন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নিহিত। প্রবাদ-প্রবচন বাংলার লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। প্রবাদ-প্রবচনে প্রত্যেক অঞ্চলের স্বকীয় লোকসংস্কৃতি জড়িত থাকে। মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে এক-একটি প্রবাদ হয়ে ওঠে ইতিহাসের কালের সাক্ষী। ফলে আজও যশোর অঞ্চলের মানুষের মুখেমুখে অনেক প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বৃহৎ জেলা যশোর। বাংলার আর্থসামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও গ্রামীণ ঐতিহ্যের উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে এ অঞ্চলে বিদ্যমান পটচিত্র, পিঁড়িচিত্র, কুলাচিত্র, আলপনা, নকশিকাঁথা, নকশিপাখা, নকশিশিকা, বাঁশ-বেতশিল্প, শোলাশিল্প, মৃৎশিল্প, মাটির ফলক, শঙ্খশিল্প প্রভৃতি চারু ও কারুশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যশোরের লোকসংস্কৃতিতে চারু ও কারুশিল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে যশোরের ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারুশিল্প এবং প্রবাদ-প্রবচনের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

যশোর পরিচিতি

যশোরের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। সে গৌরব যশোরের মৃত্তিকালগ্ন মানুষের জীবনচর্যার পরতে পরতে লোকসংস্কৃতির মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে। ভূমির সৃষ্টি ও পত্তনের ইতিহাস নিয়ে ভূতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও বাংলাদেশের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সকলেই একমত। ভূমি গঠনের বৈচিত্র্য বিবেচনা করে বাংলাদেশের উৎপত্তিকালকে কেউ টারশিয়ারি যুগ, কেউবা প্লাওসিন যুগ বলে উল্লেখ করেছেন।[১] আবার কেউ কেউ মনে করেন, দশ লক্ষ বছর আগে হিমালয়ের শেষ উত্থানের সময় বাংলার অন্যান্য ভূখণ্ডের ন্যায় যশোর ভূখণ্ডও গঠিত হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় উপবঙ্গ প্রসঙ্গে যশোরের উল্লেখ থেকে, 'উপবঙ্গে যশোরাদ্যাঃ দেশাঃ কাননসংযুক্তাঃ'।[২]

প্রাচীনকালে বাংলা বিভিন্ন জনপদ ও প্রশাসনিক এককে বিভক্ত ছিল। মুসলিম শাসনামলেও বাংলায় বিভিন্ন প্রশাসনিক একক গড়ে ওঠে। এককসমূহ ইকলীম, খিত্তা, আরসাহ, ইকতা প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হতো। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে প্রদেশ, জেলা ও থানার সৃষ্টি হয়। যশোর বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। ১৭৮৬ সনে এ জেলার সৃষ্টি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলার মধ্যে যশোর জেলার অবস্থান অন্যান্য প্রধান জেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম। বিশেষ পরিবেশে যশোরের গ্রামীণ জীবন গড়ে উঠলেও অনেক সময় আঞ্চলিক ও লোকজ বৈশিষ্ট্যের কারণে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সূক্ষ্ম পার্থক্য তৈরি হয়। সে পার্থক্য সংস্কৃতিগত ও শ্রেণিগত দিক থেকে জীবিকা-নির্বাহপ্রসূত। অর্থাৎ এক শ্রেণির মানুষ অন্য শ্রেণি থেকে বংশগত বা বৃত্তিভিত্তিক কিংবা জাতি, বর্ণভেদ ব্যবস্থার কারণে পৃথক হয়ে পড়ে। যেমন–একদিকে যে মৃত্তিকা কুমারের হাতে নিত্যদিনের ব্যবহার্য বস্তুর উপাদান হিসেবে গণ্য হয়, অপরদিকে সেই মৃত্তিকাই অন্য হাতে কারুকার্য খচিত দৃষ্টিনন্দন সামগ্রী হয়ে ওঠে। প্রাচীনকাল থেকে সূত্রধর, কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কাংস্যকার, স্বর্ণকার, চিত্রকর ও মালাকার নিজস্ব বৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে বংশপরম্পরায় সমাজের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। অনুরূপভাবে যশোরের লোকজ, চারু-কারুশিল্পীরাও নিজেদের অবস্থান থেকে সমাজের

চাহিদা পূরণ করে চলছে। অপরদিকে লোকসাহিত্য চর্চার ধারাবাহিকতায় যশোরে বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে।

উৎস পর্যালোচনা

লোকসংস্কৃতির মাঝে জড়িয়ে থাকে জাতির প্রাণসত্তা ও মূল্যবোধ। তাই লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন– Ajit Commar, Mookerjee রচিত *Folk Art of Bengal* (Calcutta, 1939); সুশীল কুমার সম্পাদিত *বাংলা প্রবাদ* (কলিকাতা, ১৩৫৯ বাংলা), কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত *লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ* (ঢাকা, ১৯৬৮), আশুতোষ ভট্টাচার্য এর *বাংলার লোকসাহিত্য* (কলকাতা, ১৯৭২), মযহারুল ইসলাম রচিত *ফোকলোর পরিচিত এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন* (ঢাকা, ১৯৭৪), মোহাম্মদ হানীফ পাঠান প্রণীত *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* (ঢাকা, ১৯৭৬), Niaz Zaman এর *The Art of Kantha Embroidery* (Dacca, 1981); Sankar Prosad Ghosh কর্তৃক রচিত *Terracottas of Bengal* (Delhi, 1986); তাপস রায় এর *নকশিকাঁথায় পাশ্চাত্য বিষয় ইতিহাস অনুসন্ধান*-৬, (কলকাতা, ১৯৯১); সৈয়দ মাহমুদুল হাসান এর *গ্রামীণ চারু-কারুকলা*, *বাংলাদেশের ইতিহাস* ৩য় খণ্ড (ঢাকা, ১৯৯৩); মুস্তফা মাসুদ এর *যশোরের লোকসাহিত্য; ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন* (ঢাকা-১৯৯৪); শফিকুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প* (ঢাকা-২০১৪); শামসুজ্জামান খান এর *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি : যশোর* (ঢাকা-২০১৪); হোসেন উদ্দিন হোসেন সম্পাদিত *বাংলার সংস্কৃতি ও লোকজীবন* (ঢাকা, ২০২৪) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে যশোরের ওপর তেমন কোনো আলোচনা স্থান পায়নি। *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি : যশোর* নামক গ্রন্থে যশোরের লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। এছাড়াও লোকসাহিত্যের বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত যশোরের ওপর *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি* গ্রন্থমালায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে লোকশিল্প ও কিছু প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রবাদ-প্রবচনের শ্রেণিবিভাগ নেই। সুতরাং যশোরের লোকসংস্কৃতির ওপর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গবেষণা-কর্ম নেই। ফলে এ গবেষণা প্রবন্ধে যশোরের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এটি বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে এবং ভবিষ্যতে গবেষকদের এ বিষয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করবে। তাছাড়া স্থানীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আলোচ্য গবেষণায় ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি (Historical Method), বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytical Method) ও জরিপ পদ্ধতি (Survey Method) অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের ক্ষেত্রে যশোরে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের নিকট সরাসরি গমনপূর্বক

সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর তথ্যসমূহ যাচাই ও বাছাইয়ের মাধ্যমে তা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও লোকসংস্কৃতি তথা চারু-কারু শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলি বিশেষ করে যশোরের লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও প্রবাদ-প্রবচনসংক্রান্ত বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

যশোরের লোকসংস্কৃতি বা চারু ও কারুশিল্প

সাধারণভাবে লোক (Folk) বা লোকায়ত কথাটি সমাজের অনগ্রসর, অধস্তন বা গ্রামীণ জনমানুষকে বুঝানো হয়। বর্তমানে লোকসংশ্লিষ্ট বিদ্যাশৃঙ্খলার উদ্ভব ও পঠনপাঠনের ফলে লোক এর অর্থ ও সংজ্ঞা ব্যাপকতা পেয়েছে। লোক হলো– সম-ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ যে-কোনো গোষ্ঠী হতে পারে তা জাতিগোষ্ঠী, আঞ্চলিক গোষ্ঠী, শহর গোষ্ঠী, গ্রাম গোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, পেশাজীবী বা অন্য যে-কোনো গোষ্ঠী। আধুনিক 'লোক' এর সংজ্ঞানুসারে প্রতিটি গোষ্ঠীই এক একটি লোকগোষ্ঠী।[৩] আবার সকলে মিলে একটি বৃহত্তর লোক এর অন্তর্গত যা বাঙালি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিশিষ্ট লোকবিদ মযহারুল ইসলাম (১৯২৯-২০০৩) এর ভাষায়, লোক কোনো নির্দিষ্ট স্তরের মানুষ নয়-সমাজের যে কোনো স্তরে লোক বাস করতে পারে-লোক বিশেষ কোনো স্থানের অধিবাসীও নয়, শহরে, নগরে বা গ্রামে সে থাকতে পারে। তবে যে স্তরে বা যে স্থানেই সে বাস করুক, লোক ঐতিহ্যের সূত্র ধরে তার সৃষ্টি কর্ম সে সম্পাদন করে, সেই ঐতিহ্যের আলোকে নতুন ঐতিহ্য সে সৃজন করে এবং তার সৃষ্টি সমাজের সামগ্রীতে পরিণত হয়, বিশেষ করে যে সমাজ মূলত ঐতিহ্যনির্ভর।[৪]

লোক আচরিত সংস্কৃতিই হলো লোকসংস্কৃতি। সুতরাং লোকসংস্কৃতি হলো লোকসমাজের অভিব্যক্তি, যে অভিব্যক্তির মধ্যে তার মানসিক চেতনা, অনুভূতি ও চিন্তার প্রতিফলন প্রকাশ পায়। যশোরের লোকসংস্কৃতি যশোরের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর্থসামাজিক কাঠামো, মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ও জীবন সম্পর্কিত চেতনার সমন্বয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। যশোর লোকশিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল হওয়ায় দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এখানের আর্থসামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসেবে পটচিত্র, নকশিকাঁথা, নকশিপাখা, বাঁশ-বেতশিল্প, শোলাশিল্প, মৃৎশিল্প, মাটির ফলক প্রভৃতি চারু-কারুশিল্প প্রচলিত রয়েছে।

১. লোকজ চারু-কারুশিল্প

ক. পটচিত্র

যশোরের গ্রামীণ অঞ্চলে পটচিত্র বিনোদনের এক উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। এ শিল্পেই বাঙালির শিল্পপ্রীতির পরিচয় নিহিত। তাই আজও নরনারীর সৌন্দর্যের তুলনায় বলা হয় 'পটের মতো সুন্দর' আর দেব-দেবীর প্রতিমাকে বলা হয় 'পটের ঠাকুর'।[৫] পটে অঙ্কিত ছবি হতে পারে পৌরাণিক কিংবা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা ও আচার অনুষ্ঠানের ছবি। পট্ট বা কাপড় শব্দ হতে পট শব্দের উৎপত্তি। পটচিত্র অঙ্কনকারীরা পটুয়া হিসেবে পরিচিত। আবার এদেরকে গণশিল্পী

হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।[৬] পটুয়ারা সুতি কাপড়ের ওপর প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর রংদ্বারা নানা ধরনের চিত্র অঙ্কন করেন। এ শিল্প ষোলো শতকের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিকাশ লাভ করে। এ সময় থেকে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মনসামঙ্গলের বিভিন্ন কাহিনি নিয়ে পট অঙ্কন শুরু হয়। কিন্তু পরবর্তীতে যম রাজের শাস্তি সম্পর্কিত চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। হিন্দুসমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও গাজীর পটচিত্রের প্রচলন রয়েছে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির অনুকরণে গাজীর কাহিনি অঙ্কন করা হয়। গাজীর পটে তিনটি বিষয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। তা হলো– গাজীর মাহাত্ম্য ও গুণকীর্তন, সামাজিক হিতোপদেশ ও যম রাজের শাস্তি।[৭] পটুয়াদের সাথে আধুনিক শিল্পীর পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক চিত্রকর্মে শিক্ষার ছাপ থাকে, চারু-কারুশিল্পে তা থাকে না। কারণ অধিকাংশ লোকশিল্পীই অশিক্ষিত। তবে তারা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে ধারণ করে বলে তাদের চিত্রকর্ম সমগ্র গ্রামীণ সমাজের হয়ে ওঠে। বস্তুত, হিন্দু ও মুসলিম সমাজে একসময়ে পটচিত্র শিল্পের যে কদর ছিল বর্তমানে আধুনিকতার প্রভাবে তা অনেকটাই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

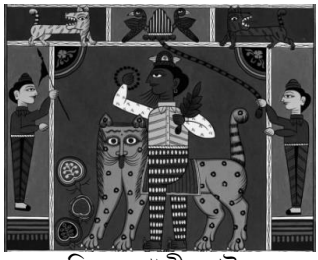

চিত্র ১: গাজীর পট।

উৎস: গাজির পট, Sirajul Islam (ed.), *Banglapedia*, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002), 19.

খ. নকশিকাঁথা

যশোর অঞ্চলের নকশিকাঁথার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। গ্রামীণ নারীদের জীবনের প্রয়োজনে তাদের দক্ষতা ও সুপ্ত প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নকশিকাঁথার উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নকশিকাঁথার প্রচলন থাকলেও যশোর অঞ্চলের কাঁথা বিশেষ বৈচিত্র্যের কারণে বিশিষ্টতার দাবিদার। এই কাঁথায় স্থানীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে বলে এটির স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা রয়েছে। কাঁথা শব্দটি সংস্কৃত 'কন্থা' শব্দ থেকে এসেছে।[৮] পুরাতন কাপড় সেলাই করে প্রথমে কাঁথার জমিন তৈরি করা হয়। অতঃপর সুচ-সুতার সাহায্যে তৈরি করা হয় বাহারি নকশা। এই বাহারি নকশার কারণেই কাঁথাগুলো পরিচিতি পেয়েছে নকশিকাঁথা নামে। নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য কাঁথায় নানা রঙের সুতা ব্যবহৃত হয়। কাঁথায় ব্যবহৃত মোটিফের মধ্যে পদ্ম, চন্দ্র, সূর্য, চাকা, সোয়াস্তিকা, জীবনবৃক্ষ, কালকা, পানি, পাহাড়, মাছ, নৌকা, পদচিহ্ন, রথ, কৃষি সরঞ্জাম, পালকি, ফুল ও পানপাতা, ময়ূর ও হাঁস ইত্যাদি। যশোরের কাঁথা আকারে ছোট ও বর্গাকার, মাঝখানে ফুল এবং অধিকাংশ জায়গায় লতাপাতা দ্বারা আবৃত। যশোরের নকশিকাঁথায় বিদেশি মোটিফও লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে নির্মিত যশোরের একটি সৃজনী

কাঁথায় অন্যান্য লোকায়ত বিষয়ের সাথে অশ্বারোহী ইউরোপীয় সেনাদের দেখানো হয়েছে।[৯] সেলাইয়ের ধারা অনুসারে নকশিকাঁথা যশোর ও রাজশাহী এ দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যশোর রীতিতে চিত্রিত কাঁথা, মোটিফ কাঁথা এবং পাহাড় কাঁথা– এ তিনটি কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, যা রাজশাহী রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[১০] বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁথা তৈরি হয়। যশোরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এনজিও সংস্থা ব্র্যাকের আওতায় এ ধরনের নকশিকাঁথার বুনন পরিচালিত হয়। ব্র্যাক ছাড়াও যশোর সদরের 'যশোর স্ট্রিট', নকশি কাজের জন্য প্রসিদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রেতারা এখান থেকে নকশিকাঁথা সংগ্রহ করে থাকে।[১১] সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে গবেষণা অঞ্চল হিসেবে যশোরে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন রীতিতে নকশিকাঁথা শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল যা আজও লোকজ শিল্পের অনন্য প্রতীক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। তবে নকশি শিল্প এতটাই ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, শুধু নকশি শিল্প বিষয়ে পৃথক গবেষণা হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় নকশি শিল্পের মধ্য থেকে ছাপা কাঁথা, আসন নকশি, দস্তরখান, নকশি জায়নামাজ, গিলাপ, নকশি শিখা প্রভৃতি শিল্পকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ২: নকশিকাঁথা।

উৎস: নকশী কাঁথা, ছবিটি লেখক কর্তৃক যশোর সদর থেকে সংগৃহীত।

গ. শোয়া কাঁথা

শোয়ার উপকরণ হিসেবে এ ধরনের নকশিকাঁথা ব্যবহৃত হয়। দুভাবে এ কাঁথা তৈরি করা হয়। বিছানোর জন্য ব্যবহৃত কাঁথার মিন প্রস্তুতের সময় ভেতরের আস্তরণে পুরু কাপড় ব্যবহার করা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এ শ্রেণির কাঁথার ক্ষেত্রে মাবন ও পাশের নকশির বিষয়টা গুরুত্ব সহকারের বিবেচনা করা হয়। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো নকশির বুনন হয় অত্যন্ত ঘন। ফলে কাঁথা অত্যন্ত মজবুত হয়। অপরদিকে গায়ের কাঁথা জমিন প্রস্তুতের সময় অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড় ব্যবহার করা হয়। এ কাঁথায় বুননের ঘনত্ব অপেক্ষা নকশায় নান্দনিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।[১২] গ্রামীণ লোকজ উপকরণ ফুল, লতাপাতা, পশুপাখি ইত্যাদি নকশা এ শ্রেণির কাঁথায় অধিক লক্ষ করা যায়।

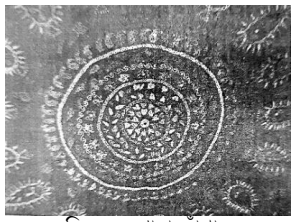

চিত্র ৩: শোয়া কাঁথা।

উৎস: শোয়া কাঁথা, ছবিটি লেখক কর্তৃক যশোর সদর থেকে সংগৃহীত।

ঘ. বালিশ বা পিলো নকশি

যশোর অঞ্চলে বালিশ বা সোফার পিলো কভারে একরকম নকশির প্রচলন আছে। এ শ্রেণির নকশির বৈশিষ্ট্য হলো বুননের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়দ্বারা সেলাই করা হয়। এছাড়া এর জমিন তৈরির জন্য পৃথক কোনো কাপড়ের ব্যবহার করা হয় না, পরিবর্তে উভয় পিঠে এক বা দুই রাঙা কাপড় ব্যবহার করা হয়।[১৩]

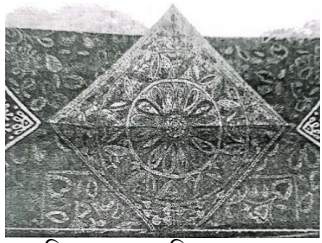

চিত্র ৪: সোফার পিলো কভার।

উৎস: সোফার পিলো কভার, *লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থ*, ১২৩।

ঙ. ওয়াল ম্যাট

সম্প্রতি যশোর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ওয়ালম্যাট তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের বাইরে এর বিস্তর চাহিদা রয়েছে। নতুন কাপড়ের জমিনের নান্দনিক বিভিন্ন চিত্র জীবন্ত করে কারিগররা ওয়াল তৈরি করেন। এক্ষেত্রে গ্রামবাংলার চিরচেনা দৃশ্য, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর নকশা ইত্যাদি প্রাধান্য পায়।[১৪] একজন সাধারণ কারিগরের তাঁতের বুনন ফ্রেমে বন্দি হয়ে শেষ পর্যন্ত ওয়ালম্যাটটি বিত্তবানের রুচি ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ড্রয়িং রুমে শোভা পায়।

চিত্র ৫: নকশি ওয়াল ম্যাট।

উৎস: নকশি ওয়াল ম্যাট, *লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থ*, ১২৭।

যশোরের ঘূর্ণি এলাকায় ১৯৮৯ সালে আছিয়া বেগমের নেতৃত্বে 'সংস্কার' নামে একটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক সমিতি গড়ে ওঠে।[১৫] তাঁর নেতৃত্বে মহিলারা নকশি কাঁথা, পটচিত্র, ওয়ালম্যাট এবং আলপনার কাজ করে থাকে। জীবনের সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনা তাদের সূচিশিল্পে প্রকাশ পায়। জীবন আলেখ্য ফুঠে ওঠে তাদের নিপুণ শিল্পগুণে। ফলে যশোরের নকশি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশিদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

চ. নকশি পাখা

দীর্ঘকাল থেকে বাংলার শহর ও গ্রামীণ মানুষ গরম নিবারণের জন্য হাতপাখা ব্যবহার করে আসছে। হাতপাখার ওই শীতল বাতাসকে কেন্দ্র করে সংগীতশিল্পী এবং কবিরা গান ও কবিতা রচনা করেছেন। হাতপাখাকে কেন্দ্র করে ২০১৬ সালে গীতিকার মোহাম্মদ রফিকুজ্জামন একটি গান রচনা করেন। গানটির সুরকার রাজেশ এবং গায়ক আকবর। কবি হেলাল হাফিজ হাতপাখাকে অবলম্বন করে 'প্রস্থান' নামক কবিতা রচনা করেছেন।[১৬] পাখার ওপর নানা ধরনের নকশা অঙ্কন করা হয় বলে এ পাখা নকশি পাখা হিসেবে পরিচিত। এ পাখা তৈরিতে বাঁশ, বেত, ফিতা, সুতা, খেজুরপাতা, তালপাতা, শণ, কলার শুকনো খোল, পাখির পালক, শোলা, কাপড়, কাশ, গমের ডাটা, মোটা কাগজ, চন্দন কাঠ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[১৭] পাখায় নকশা অঙ্কনে লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা এবং পশু পাখির বিভিন্ন মোটিফ ব্যবহার করা হয়। নির্মাণ উপকরণের ওপর ভিত্তি করে পাখার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। যেমন– সুতা দ্বারা তৈরিকৃত পাখা শঙ্কলতা, তারা ফুল, বলদের চোখ, সাগরদিঘি, বাঁশদ্বারা তৈরিকৃত পাখা– গুলপাতা, তারাফুল, ছিটাফুল, ভালোবাসা, হাতি, মানুষ এবং বেতের তৈরি পাখা পালঙ্ক পোষ, পাশারদান প্রভৃতি নামে পরিচিত।[১৮] এছাড়াও পাখার ওপর বিভিন্ন প্রবাদ বাক্য, নীতিকথা ও ছড়া লক্ষ করা যায়। বস্তুত বৈদ্যুতিক পাখা আবিষ্কার হওয়ায় গ্রামীণ পাখার ব্যবহার হ্রাস পেলেও এর আবেদন একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণের ফলে পাখা শিল্প গ্রামবাংলার মানুষের শুধু নয়, নাগরিক জীবনেও 'গরমকালের পরম পাখা' হিসেবে যেমন মর্যাদা পেয়েছে, তেমনি বাণিজ্যিকভাবেও পেয়েছে সফলতা। তবে ব্যাবহারিক প্রয়োজনই চারু-কারু শিল্পের শেষ কথা নয়। লোক-মানব সৃষ্ট এ শিল্পকর্ম নিত্যদিনের ব্যাবহারিক প্রয়োজন মিটিয়েও শৈল্পিক নান্দনিকতা এবং বহুজনের ভালোবাসার স্পর্শে গোটা সমাজেরই প্রতীক হয়ে ওঠে।

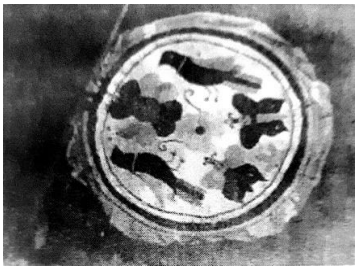

চিত্র ৬: নকশি পাখা।

উৎস: নকশি পাখা, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৫৫৭।

ছ. শঙ্খ শিল্প

সনাতন ধর্মীয় বিধিতে সন্ধ্যায় শাঁখ বা শঙ্খ বাজানো রীতি প্রচলিত। তাছাড়া বিয়ে, পূজা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজানো হয়। এ শঙ্খকে শিল্পী হিসেবে বেছে নিয়ে যারা জীবিকানির্বাহ করেন তাদেরকে 'শাঁখারি' বলা হয়। সামুদ্রিক শঙ্খকে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা ব্যবহার উপযোগী করা হয়। শঙ্খ কেটে তাতে নানা লতা-পাতা এঁকে শঙ্খের চুড়ি তৈরি করে শঙ্খ শিল্পীরা; যা 'শাঁখা' বলে পরিচিত। এটা বিবাহিত হিন্দু মহিলারা ব্যবহার করেন। শাখা ও সিন্দূর বিবাহের পবিত্রতার প্রতীক বলে বিবেচিত। শঙ্খ শিল্পীকে ঘিরে যশোরের অভয়নগরে শঙ্খ শিল্পী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। নওয়াপাড়া বাজার 'সোনালী শঙ্খ ভাণ্ডার' নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শঙ্খ ব্যবহারের সাথে লোকবিশ্বাস গভীরভাবে সম্পৃক্ত। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট যুগ যুগ ধরে লালিত এ বিশ্বাস হিন্দু পুরাণ তথা মিথ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

জ. বাঁশ ও বেত শিল্প

কারুশিল্পের আরেকটি ধারা বাঁশ ও বেতের কাজ। কারুবৃত্তিজীবী এ শিল্পীরা সামাজিকভাবে খুবই বঞ্চিত এবং এ বৃত্তি তাদের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঋষিরা বাঁশ-বেত শিল্পের সাথে জড়িত। যশোরের নারকেল বাড়িয়া, শেখের হাট ও রামচন্দ্রপুর গ্রামে ঋষি সম্প্রদায় বসবাস করেন। এ অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ ও বেত বাগান রয়েছে। শিল্পীরা বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি, ডালা, কুলো, মাথাল, খাঁচা, খালই, খাদুন, পোলো, ঘুণি, চারো, ট্যাপারি ইত্যাদি তৈরি করেন। যশোরের অভয়নগর উপজেলার খাল, বিল ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফলে এখানে বাঁশ শিল্পের ব্যবহার অধিক পরিলক্ষিত হয়।[১৯] বেত ও বেতজাত দ্রব্যের ব্যবহার লোকঐতিহ্যকে লালন করে। বেত দিয়ে ধামা, খুচি, মোড়া, চেয়ার, ঝাঁপি, সাঁজি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এছাড়াও লোকবাদ্য যেমন– ঢোল, তবলা, একতারা, দোতারাসহ বিভিন্ন উপকরণে বেতের ব্যবহার হয়।

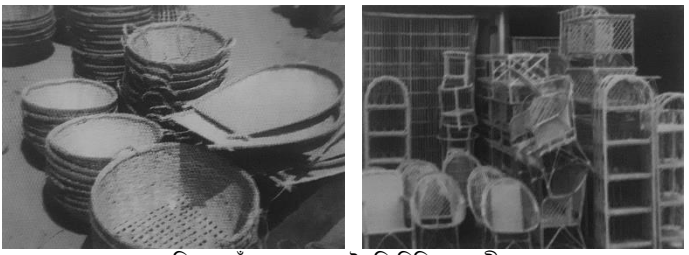

চিত্র ৭: বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী।

উৎস: বাঁশ ও বেতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী, Sirajul Islam (ed.), *Banglapedia,* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002), 17.

ঝ. শোলা শিল্প

যশোরের বিল এলাকায় প্রচুর শোলা জন্মে। শোলা দিয়ে ছোট ছেলে মেয়েদের খেলনার পুতুল, মুকুট, মালা, চালচিত্র, কমদফুল, টোপর ও নানা ধরনের ফুল তৈরি হয়। তবে ফুল ও টোপর সাধারণত হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয়ে থাকে।

হিন্দুদের বরকনের বিয়ের আসরের মাথার টোপর ও দেবদেবীর মাথার টোপর ছাড়াও লোকবিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত ধানের গোলা ঘরে টাঙানো ফুল শোলা দিয়ে তৈরি হয়। বাসন্তী পূজায়ও শোলার ফুলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যারা শোলা সামগ্রী তৈরি করেন তারা 'মালাকার'[২০] হিসেবে পরিচিত। যশোর জেলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে শোলা শিল্পের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৮: শোলা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ফুল।

উৎস: শোলার তৈরি বিভিন্ন ফুল, Sirajul Islam (ed.), *Banglapedia*, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002), 22.

ঞ. পাখির বাসা

যশোর সদর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জমিপাড়া, বাহাদুরপুর। এখানে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় কুটিরশিল্পের অসাধারণ নিদর্শন হিসেবে পাখির বাসা।[২১] হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকজন সাধারণ মানুষ তাদের শৈল্পিক দক্ষতার কারণে এখানে অনেকের কাছ হয়ে উঠেছেন অসাধারণ। তাদের তৈরিকৃত পাখির বাসা একদিকে যেমন ঘরের শোভাবর্ধক, অপরদিকে পাখির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এটি পরিবেশ রক্ষারও উপায়। দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে পাখিদের রক্ষার জন্য এটি অনেকটাই স্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে পরিগণিত। বাসার নির্মাণ প্রক্রিয়া সরল প্রকৃতির। অনেকটাই গরুর ঠুসির আদলে তৈরি করা হয়। ফলে পাখিদের নিরাপদে বসবাস ও প্রজননের সুবিধা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে তৈরিকৃত পাখির বাসা, কলস, ফুলদানি, পটোল ফুলদানি বিদেশে রপ্তানি করা হয়।[২২]

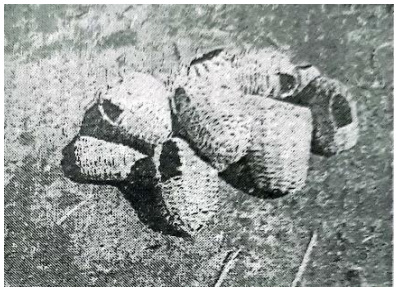

চিত্র ৯: পাখির বাসা।

উৎস: পাখির বাসা, *লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থ*, ১২০।

ট. মৃৎশিল্প

বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম। এ শিল্পের সাথে সভ্যতা ও সংস্কৃতির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের মধ্যে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা অঞ্চলে পোড়ামাটির শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৩] সম্ভবত এ সময় থেকে বাংলায় মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ মাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মাটি ও পানি একত্রে মিশিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাল বংশের লোকেরা প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী তৈরি করেন। তারা মাটি দিয়ে হাঁড়িপাতিল, হুক্কা, কল্কে, কলসি, খোলা, পুতুল, মূর্তি, ফুলদানি, ছাইদানি, জলকান্দা, দধির হাঁড়ি, ঢাকনা, থালাবাসন, বদনা, পেয়ালা, বাটি, মালসা, প্রদীপ ও কুপি তৈরি করেন।[২৪] পয়সা জমানো পাত্র হিসেবে মাটির ব্যাংক অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিভিন্ন আকৃতিতে এ ব্যাংক তৈরি করা হয়। যেমন– মাছ, মোরগ, পাখি, তাল, আম, বেল, কুমড়া, নারিকেল প্রভৃতি। এ মাটির সামগ্রী নির্মাণকারীদেরকে কুমোর বা কুম্ভকার বলা হয়। পেশা অনুযায়ী কুম্ভকাররা 'কুচল', 'হাম্মর' ও দেওরা–এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যারা ছোট মৃৎপাত্র নির্মাণ করেন তারা কুচল, বড় পাত্র নির্মাতারা হাম্মর এবং প্রতিমা নির্মাতারা দেওরা হিসেবে পরিচিত।[২৫]

যশোর সদুল্যাপুর গ্রামের পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া শাঁখারীপাড়া (দেয়াপাড়া) গ্রামের নারায়ণ পাল ও গুণধর পাল এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মৃৎশিল্পীরা নানা ছাঁচে তাদের শিল্পকর্ম গড়ে তোলেন। বিশেষ মৌসুমকে কেন্দ্র করে তারা হাঁড়ি, কলস ও সরা নান্দনিক নকশা করে হাট বাজারে উপস্থিত করেন। যেমন– লক্ষ্মীর সরা, নবান্ন বা বৈশাখ পার্বণে রংতুলি দিয়ে সৌন্দর্যের ডালি সাজানো হয়। বাঘারপাড়া উপজেলরা দিয়াপাড়া, আন্দোলন বাড়িয়া, দোহাকুলো ও দরাজহাট গ্রামে পাল বংশের লোকেরা বসবাস করেন। তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মৃৎশিল্পের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় যশোরের অভয়নগর উপজেলার পালপাড়া, পাকের গাতি, চালশিয়া প্রভৃতি গ্রামে। একসময় যশোর শহরে পালদের কর্মতৎপরতা বিদ্যমান ছিল। আজও যশোর শহরে 'পাল বাড়ির মোড়' নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান রয়েছে। যাহোক বর্তমানে এ শিল্পীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। শিল্পীরা এ পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করছেন। ফলে মৃৎশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ১০: মৃৎপাত্র।

উৎস: মৃৎপাত্র, *লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থ*, ১১৬।

ঠ. মাটির ফলক

মৃৎশিল্পের সম্প্রসারিত রূপ হলো মাটির ফলক, এটি 'টেরাকোটা' নামে পরিচিত। পোড়ামাটির ফলক গৃহসজ্জার উপকরণ ব্যতীত বাংলার রমণীদের অলংকার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এই ফলক বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ইমারত তথা মন্দির ও মসজিদে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।[২৬] ধর্মীয় ইমারতে ব্যবহৃত ফলক বাংলার লোকজ শিল্পধারার পরিচয় বহন করে। মাটির ফলক নকশার বিষয়বস্তু হলো– অর্ধ প্রস্ফুটিত ফুল, কিন্নর-কিন্নরী, দণ্ডায়মান গ্রামীণ মানুষ, জীবজন্তু, রাজা-রানি, হাতি, হরিণ, ময়ূর ইত্যাদি। ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে শিব, বিষ্ণু, গণেশ, মঞ্জুশ্রী, তারা ও ব্রহ্মা প্রধান। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্না, আনন্দোল্লাস, ব্যথা-বেদনা এবং জীবনধারাও পোড়ামাটির ফলকে প্রতিফলিত হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় স্থাপত্যে জ্যামিতিক নকশার ফলক লক্ষ করা যায়।[২৭] এসব ফলক নকশার মধ্যে যশোর অঞ্চলের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবন-জীবিকার অন্বেষায় যে শিল্পকর্ম বিক্রি করে লোকজ কারু ও চারুশিল্পীরা তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন, আধুনিকতার ছোঁয়ায় তা এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তবু তারা একেবারে থেমে যাননি। বৈশাখী মেলা, বাসন্তী মেলা, রথের মেলা ও হাট-বাজারে এখানে যে পরিমাণ মৃৎশিল্পের দ্রব্য সামগ্রীর আগমন ঘটে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যশোরের এ শিল্পের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তবে কাঁচামালের স্বল্পতা ও মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পীরা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তবুও সমকালীন চাহিদা মিটিয়ে যশোরের লোকজ কারু ও চারু শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পীকে চিরায়ত করে তুলবেন এটাই প্রত্যাশা।

চিত্র ১১: মন্দিরের টেরাকোটা।

উৎস: মন্দিরের টেরাকোটা, রানা চক্রবর্তী, 'বাংলার মন্দিরের টেরাকোটার সমাজচিত্র'।
https://www.facebook.com/rana.chakraborty.397/posts/8592714540782413, ৮ নভেম্বর, ২০২১।

২. প্রবাদ-প্রবচন

লোকসংস্কৃতির বহুল চর্চিত ও সর্বত্র প্রচলিত অন্যতম উপাদান হলো প্রবাদ-প্রবচন। গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে অনেকটা সূত্রাবদ্ধ করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ছড়িয়ে দিয়েছে এবং এটি প্রবাদ-প্রবচন হিসেবে যুগ যুগ ধরে লোকমুখে টিকে আছে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কথা সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে গদ্য বা পদ্যাকারে প্রকাশের নামই প্রবাদ। প্রবাদ বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ, যুক্তিকে জোরালো ও প্রকাশকে অর্থবহ

করে তোলে। মানুষের অন্তর্লোকে এর উদ্ভব, সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এর ব্যবহার। প্রবাদ একদিকে ইতিহাসের আকর, অপরদিকে সমাজের শিকড়। প্রবাদের শিকড় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঐতিহ্য থেকে রস সঞ্চয় করে প্রবাদ অর্থপূর্ণ হয় এবং ভাষার মধ্যে বহমান থেকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বাংলা প্রবাদের ভান্ডার বিপুল ও বৈচিত্র্যময়। প্রবাদ একজনের সহজ বুদ্ধিতে সহসা প্রতিফলিত হলেও এগুলো বহুজনের সুলভ বুদ্ধির উপায় ও সংক্ষিপ্ত প্রয়োগের অস্ত্র।[২৮] তাই প্রবাদের ভেতর দিয়ে জীবনের শ্লেষ, ব্যঙ্গ, টিপ্পনী, উপহাস, কৌতুক ইত্যাদি ভাবানুষঙ্গের সরস ও সহজ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বাঙালির গৃহ-পরিবার ও সমাজ জীবনের বিচিত্র দিক প্রবাদের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রবাদের সমার্থ নাম বচন ও প্রবচন। বাংলায় 'বচন' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। যেমন– ডাকের বচন, খনার বচন, বৃদ্ধের বচন ইত্যাদি। বর্তমানে প্রবাদ বলতে যা বুঝায় একসময় বচন শব্দটি দিয়ে তা বুঝানো হতো। বচন শব্দের অর্থ কথন বা ভাষণ আর প্রবচন শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট কথন বা প্রকৃত ভাষণ।[২৯] অতএব, বচনের শব্দ যতটা অলংকারবিহীন, প্রবচনের কথন ততটা অলংকারবিহীন নয়। প্রবচন এর মধ্যে যে শিল্পের ভাব রয়েছে, বচন এর মধ্যে তা অনুভব হয় না। এ কারণেই প্রবাদের পর সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রবচন শব্দটি অধিক স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও অর্থের তেমন কোনো পার্থক্য নেই, তবুও কথার মাঝে শূন্যতা যেন না থাকে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রবাদের সাথে প্রবচন শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়।

প্রবাদ-প্রবচনের শ্রেণিবিভাগ

প্রতিটি অঞ্চলে ভাষা অনুযায়ী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত। প্রত্যেক অঞ্চলের স্বকীয় সংস্কৃতি জড়িত থাকে প্রবাদ-প্রবচনে। যশোর অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচন লোকসাহিত্যে ছড়িয়ে থাকা অমূল্য সম্পদ। এগুলো মানুষের মুখেমুখে বেঁচে আছে। বিশেষ করে বাড়ির আনাচে-কানাচে ও সংসারের ঘটনাপ্রবাহে মানুষ প্রবাদের মোক্ষম অস্ত্র ছুড়ে কখনো আনন্দ, কখনো দুঃখ, আবার কখনো কৌতুকও অনুভব করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রবাদের প্রয়োগবিধি লক্ষ করায় যশোর অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

ক. মানব চরিত্র-বিষয়ক প্রবাদ

স্বভাব মানুষের চরিত্রের এমনই উপাদান যে তাকে সহজে বদলানো যায় না। এ কারণেই যশোরের গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত হয়েছে– 'ইল্লেত যায় না ধুলি, খাইজেত যায় না ম'লি।'[৩০] কারো স্বভাব ভালো হলে তাকে উপদেশ দিলে কাজে লাগে আর যদি বেহায়া স্বভাবের হয় তাহলে উপদেশ কোনো কাজে লাগে না। অর্থাৎ চেষ্টা করলেও স্বভাবের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। তাই বলা হয়– 'কুহুরির প্যাটে ঘি-ভাত সয় না।' অর্থাৎ কোনো কিছু অপাত্রে দান করলে তাঁর অমর্যাদাই হয়। আবার কেউ কেউ আছে কারো দ্বারা উপকৃত হলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; বরং ক্ষতি করে থাকে। এরূপ আরো প্রবাদ রয়েছে। যেমন– 'যে পাতে খায়, সেই পাতে হাগে।' 'যার পরে, তার খায়, তা'রই

ভিটায় ঘুঘু চরায়।'[৩১] এ সকল প্রবাদে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের চিত্র ও চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষের স্বভাব ও আচরণের অনিষ্টকর ও অপ্রীতিকর দিকটি ফুটে উঠেছে।

খ. অনুকরণ-বিষয়ক প্রবাদ

প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজের আলোকে অনুকরণ-বিষয়ক প্রবাদ প্রচলিত। সমাজে বড়দের অনুকরণ করা একটি রীতি রয়েছে। ছোট ভাই বড় ভাইকে অনুকরণ করে। বড় ভাই প্রতিষ্ঠা পেলে ছোট ভাই তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। তাই জমির হাল দিয়ে রূপক হিসেবে এ ধরনের একটি প্রবাদ যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত রয়েছে– 'আগ আলাও যেমনি, পাছ আলাও তেমনি।'[৩২]

গ. সময় সচেতন-বিষয়ক প্রবাদ

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা অলসতা করে সময় নষ্ট করে। শেষ মুহূর্তে টনক নড়লেও কাজে সফল হতে পারে না। তাই বলা হয়– 'সময়ে একট ফোঁড়, অসময়ে দশ ফোঁড়।' আবার বলা হয়- 'বুঝলিনারে ফেলি, বুঝবি দিন গেলি।'[৩৩] অর্থাৎ সময় থাকতে কাজ না করলে তাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

ঘ. বাইরের পরিপাটি-বিয়ষক প্রবাদ

গ্রামীণ সমাজে অনেক পরিবার নিজেদের মানমর্যাদা ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখে। সামর্থ্য না থাকলেও চেষ্টা করে বাইরের ঠাট বজায় রাখতে। তাদের এই বাহ্যিক বিলাসিতা প্রবাদে ফুটে উঠেছে। 'পুঙ্গার নেই ছাল চামড়া, নুনদে খায় কাঁচা আমড়া', কিংবা, 'প্যাটে ভাত নেই কোটে সিন্দূর'। আরো বলা হয়– 'তিন দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন', কিংবা, 'পুকুরি পানি নেই কুলি খপ খপ'। 'ভিতরে ফাঁক যত যার, বাইরে ঢাক তত তার'। 'প্যাটে নেই ভাত, ব্রাশে মাজে দাঁত।'[৩৪]

ঙ. সুযোগসন্ধানী-বিষয়ক প্রবাদ

সমাজে কিছু মানুষ রয়েছে যারা সবসময় সুযোগসন্ধানী হয়। নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করে কেটে পড়ে। বিবেক দিয়ে কখনো ভাবতে চায় না যে তার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হচ্ছে কি না। তাই এ ধরনের মানুষ সর্বদাই সুযোগের অপেক্ষা থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে যশোরে গ্রামীণ পরিবেশে বলা হয় 'মামুগের বাড়ি আগুন লাগেছে এই সলকে পার হ।'[৩৫]

চ. দারিদ্র্য ও বিপদ-সংক্রান্ত প্রবাদ

যশোরে গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কোনো কোনো সংসারে অভাব লেগেই থাকে। তাই বলা হয় 'নুন আন্‌তি পান্তা, পান্তা আন্‌তি নুন।'[৩৬] অর্থাৎ, ভীষণ দারিদ্র্যের মাঝে সংসারে একটি জিনিসের ব্যবস্থা করতে করতে আরেকটি জিনিস ফুরিয়ে যায়। অন্যদিকে পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটলেও আচরণের কেনো পরিবর্তন হয় না। তখন বলা হয়– 'শকুন যতই উপরে উঠুক, নজর থাকে নীচে।'[৩৭] আবার একসময় কোনো কোনো মানুষের জীবনে ভীষণ বিপদ নেমে আসে।

তখন সে চারদিকে অন্ধকার দেখে। এই অবস্থায় বিপদগ্রস্ত মানুষটিকে লক্ষ করে বলা হয় 'অভাগা যেদিকে তাকায় সাগর সেদিকে শুকায়।'[৩৮]

ছ. অবজ্ঞা-বিষয়ক প্রবাদ

সমাজের গরিব মানুষ সাধারণত ধনীদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে থাকে। ধনী ও অভিজাতদের সামনে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গরিবরা কথা বলতে গেলে তাদেরকে অপমান করে থামিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় 'আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে লাভ কী?'[৩৯] অনেক সময় বাড়ির পাশের গুণী লোকদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে দূরের ও বাইরের কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এরূপ ঘটনায় প্রবাদ হলো 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।'[৪০] অবশ্য গুণী ব্যক্তির নিজ এলাকায় যোগ্য সম্মান না পাওয়াটা মোটেও সমীচীন নয়।

জ. মাতৃপ্রেম-বিষয়ক প্রবাদ

বাবা-মা উভয়েই সন্তানকে ভালোবাসেন। অনেক সময় বাবা বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকায় সন্তানের প্রতি যথাযথ নজর দিতে পারেন না। এমতাবস্থায় বলা হয়-

'মায় জানে পুতির দরদ বাপে জানে চ্যাট,
বাপের পোড়ে চ্যাট আর মা-র পোড়ে প্যাট।'[৪১]

এই প্রবাদটির মধ্যে তিক্ততামিশ্রিত একপেশে মানসিকতা প্রকাশ পেলেও এর মধ্যে যেটুকু মনস্তাত্ত্বিক সত্য নিহিত রয়েছে তা এই যে, সন্তানের প্রতি মায়ের দরদ ও ভালোবাসা পরিমাণে একটু বেশিই হয়।

ঝ. সম্পর্ক-বিষয়ক প্রবাদ

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে ঝগড়া কিংবা কথা কাটাকাটি হলে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তখন আবেগের সাথে এই প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে 'আপন কোনোদিন পর হয় না, আর পর কোনোদিন আপন হয় না।'[৪২] আবার নিজেদের মধ্যে কারো স্বার্থে আঘাত লাগলে মনের দুঃখে বলে ওঠে 'ঘরের চেয়ে পর ভালো, পরের চেয়ে জঙ্গল ভালো।'[৪৩]

ঞ. স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রবাদ

গ্রামের অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্য সচেতন নয়। সকালে ও রাতে খাদ্য গ্রহণের পরপরই মানুষের মলত্যাগের বদ অভ্যাস রয়েছে; আর একটি হলো বিছানায় শুয়ে জেগে জেগে রাত কাটানো। উভয়টি অসুস্থতার লক্ষণ। তাই বলা হয়– 'খেয়ে হাগে শুয়ে জাগে, সে মানুষ না কাজে লাগে।'[৪৪] যে ব্যক্তির খাওয়ার পরপরই মলত্যাগ এবং বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত কাটানোর বদভ্যাস রয়েছে, এরূপ ব্যক্তি ইনসোমনিয়ার রোগী হিসেবে বিবেচিত।

ট. কৃষি-বিষয়ক প্রবাদ

কৃষিনির্ভর বাংলায় কৃষকদের কল্যাণে ও সতর্কতার জন্য সমাজে অনেক প্রবাদ চালু রয়েছে। যেমন– 'ধান নষ্ট গাদায়, তিল নষ্ট কাদায়।'[৪৫] কৃষকদের হিতার্থে প্রবাদটি

রচিত। কারণ ধান গাদা দিয়ে রাখলে নষ্ট হয়ে যায়, ধানে গাছ বের হলে ধানের চাউল নষ্ট হয়ে যায় এবং খাদ্যের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অপর দিকে স্যাঁতসেঁতে কাদা মাটিতে তিল চাষ হয় না। তিল চাষের জন্য শুকনো মাটি ও রৌদ্র প্রয়োজন হয়। যদিও এ সতর্কবাণী স্মরণ রাখতে চাষিরা কখনো ভুল করেন না।

উপসংহার

বাংলায় উনিশ শতকের নবজাগরণ ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যচর্চাকে বেগবান করে। সে সময় থেকে অদ্যাবধি গ্রামের তাঁতি, কারুশিল্পী ও চারু শিল্পীরা নান্দনিক শিল্পদ্রব্য তৈরি করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগায় চারু ও কারুশিল্পের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় অনেকেই জীবিকার অন্বেষণে পেশা ত্যাগ করছেন। তবুও শহরের কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার ফলে শিকড়ের প্রতি মানুষের ভালোবাসা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাই দেশজ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখনো যশোরের শ্রমজীবী মানুষ পাল পাড়ায়, কুমার পাড়ায়, তাঁতি পাড়ায়, ঋষি পাড়ায় তাদের সৃজনশীল কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তবে চারু ও কারু শিল্পীদের শিল্পদ্রব্য তৈরির ক্ষেত্রে সমস্যা ও তাদের জীবিকা সংকুচিত হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এমনকি তাদের সমস্যাসংক্রান্ত বিষয়ে পৃথক গবেষণা হতে পারে। অপরদিকে প্রবাদ-প্রবচন আমাদের নিজস্ব লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য যা ইতিহাসের ভিতকে সমৃদ্ধ করে। যশোর অঞ্চলের বাংলা প্রবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যে পরিচয় পাই তা অত্যন্ত মূল্যবান। এ প্রবন্ধে মাত্র কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও অনেক প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে যে বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তাই এ প্রবাদ-প্রবচনসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করলে বাঙালির দেশীয় শিকড়ের ভিত যেমন মজবুত হবে তেমনি জাতি স্বদেশপ্রেমেও উজ্জীবিত হবে।

তথ্যসূত্র:

১ অতুল সুর, *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০২), ৩৫।

২ আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *যশোর জেলার ইতিহাস*, (ঢাকা: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৮৯), ১৮।

৩ সুস্মিতা পোদ্দার, *লোকসংস্কৃতি: ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, (কোলকাতা: লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১), ৫।

৪ মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), ১২।

৫ বিমলেন্দু চক্রবর্তী, 'বাংলার শিল্প', *ভারত বিচিত্রা*, (ঢাকা: জানুয়ারি, ২০০৪), পৃ. ৬; সুরঞ্জন রায়, 'নড়াইল জেলার লোকসংস্কৃতি ও প্রত্নসম্পদ', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, পঞ্চবিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ২০৭।

৬ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, 'গ্রামীণ চারু-কারুকলা', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), ৫৪১।

৭ তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প*, (সোনারগাঁও: বাংলাদেশ লোক কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭), ৪৮-৫০; শাহনাজ হুসনে জাহান লীনা, 'গাজীর পট: উপস্থাপনা রীতি, চিত্রাঙ্কন শৈলী ও উৎস',

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৭), ১৭।

৮ Niaz Zaman, *The Art of Kantha Embroidary,* (Dacca: Shilpakala Academy, 1981), 12-17.

৯ তাপস রায়, 'নকশিকাঁথায় পাশ্চাত্য বিষয়', *ইতিহাস অনুসন্ধান*-৬, আব্দুল ওহাব মাহমুদ সম্পাদিত, (কলকাতা: কে পি বাগাচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯১), ২৩৭।

১০ Niaz Zaman, *Op.cit,* 20; সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, ৫৪৮।

১১ সাক্ষাৎকার, মো. মাসুদ পারভেজ, পিতা- ইকরাজ উদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম-শাখারিগাতী, রূপদিয়া, যশোর সদর, বয়স ৫৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম.এ. সহকারী অধ্যাপক, আরবি, যশোর মহিলা কামিল মাদরাসা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জমান (১০ মার্চ, ২০২৫, যশোর সদর)।

১২ শামসুজ্জমান খান (সম্পা.) *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- যশোর*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২৪), ১২২।

১৩ সাক্ষাৎকার, পারভেজ, *প্রাগুক্ত*, ১২৩।

১৪ *প্রাগুক্ত*।

১৫ ঐ, ১২৪।

১৬ শিল্পী আকবরের কণ্ঠে হাত পাখার গান:

'তোমার হাত পাখার বাতাসে
প্রাণ জুড়িয়ে আসে,
কিছু সময় আরো তুমি
থাকো আমার পাশে...।'

কবি হেলাল হাফিজ (১৯৪৮-২০২৪) তাঁর 'প্রস্থান' কবিতায় তাল পাখার উল্লেখ করে বলেন–

'এখন তুমি কোথায় আছো কেমন আছো, পত্র দিয়ো
এক বিকেলে মেলায় কেনা খামখেয়ালী তাল পাখাটা
খুব নিশীথে তোমার হাতে কেমন আছে, পত্র দিয়ো...।'

১৭ হাসান, 'গ্রামীণ চারু-কারুকলা', *প্রাগুপ্ত*, ৫৪৯।

১৮ *প্রাগুক্ত*, ৫৪৯।

১৯ সাক্ষাৎকার, মোঃ শাহীনুল ইসলাম, পিতা-মোঃ ইদ্রিস আলী, গ্রাম-বালিয়াডাঙ্গা, অভয়নগর, বয়স-৪৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএ, প্রভাষক, পল্লীমঙ্গল কলেজ, অভয়নগর, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জমান (অভয়নগর, যশোর, এপ্রিল ২৯, ২০২৫); সাক্ষাৎকার।

২০ হাসান, 'গ্রামীণ চারু-কারুকলা', *প্রাগুক্ত*, ৫৫০।

২১ মোহাম্মদ মোজাম্মেল। পিতা- মোঃ আব্দুল্লাহ, বাহাদুরপুর, বয়স- ৪২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএ, সহকারী শিক্ষক, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান (যশোর সদর, এপ্রিল ৬, ২০২৫)।

২২ মোজাম্মেল, সাক্ষাৎকার; খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- যশোর*, ১২০।

২৩ শফিকুর রহমান চৌধুরী, *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), ১৩।

২৪ *প্রাগুক্ত*, ১৫।

২৫ অসিতবরণ পাল, 'ধামরাই এর ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প: একটি পর্যালোচনা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, (ঢাকা: মাঘ-চৈত্র ১৩৯৯), ১৩৭।

২৬ Sankar Prosad Ghosh, *Teracotta of Bengal,* (Delhi: BR Publishing Corporafion, 1986), 26; হাসান, 'গ্রামীণ চারু ও কারুকলা', ৫৫১।

২৭ GS Dutta, 'Bengali Teracottas', *Journal of the Indian Society of Oriental Art,* Vol.VI, (Calcutta: 1938), 169; হাসান, 'গ্রামীণ চারু ও কারুকলা', ৫৫১।

২৮ সুশীল কুমার দে (সম্পা.), *বাংলা প্রবাদ*, (কলিকাতা: এ মুখার্জী এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৩৫৯), ৩; মিজান রহমান, *ফোকলোর তত্ত্ব ও বাংলা লোকসাহিত্য* (ঢাকা: ভাষা প্রকাশ, ২০২৩), ১৪৭-১৪৯।

২৯ মুহম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), ৩৫৮; মোঃ হারুন-অর-রশীদ, *রবীন্দ্র কাব্যে প্রবচন* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), ১-৩।

৩০ ইল্লেত অর্থ-গ্লানি, ময়লা আর খাইজেত শব্দটি আরবি খাছিয়াত থেকে। অর্থ স্বভাব-চরিত্র; মো. আবুল খায়ের, পিতা-মো. রহমত আলী, গ্রাম-গোরপাড়া, শার্শা, বয়স-৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ. বিএড. শার্শা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান (শার্শা চেকপোস্ট, যশোর, এপ্রিল ২৯, ২০২৫)।

৩১ ওয়াকিল আহমেদ, *প্রবাদ ও প্রবচন*, (ঢাকা: আনন্দধারা, ২০০৯), ২২; মোহাম্মদ হানীফ পাঠান, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬), ভূমিকা ১৪-১৫ এবং ১৩৭; খায়ের, সাক্ষাৎকার।

৩২ ওয়াকিল আহমেদ, *লোকসাহিত্য*, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), ৩৩২; খায়ের, সাক্ষাৎকার।

৩৩ মোঃ শাকিল আহম্মদ, পিতা-আহম্মদ হোসেন, বয়স ৩০, শিক্ষাগত যোগ্যতা এমএসসি, সহকারী শিক্ষক (কৃষি), কে কে আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাঘারপাড়া, যশোর। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান (হামিদপুর, যশোর সদর, ২২ অক্টোবর ২০২৫); Muhammad Zamir, *Anthology of Bengali Proverbs and Bachans,* (Dhaka: Bangla Academy, 2003), 95.

৩৪ ইসলাম, সাক্ষাৎকার। Muhammad Zamir, *Op.cit,* 21; প্রবাদ-প্রবচন, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৯*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট, ২০০৭), ৩১১

৩৫ মামুগের অর্থ-মামাদের, সলক অর্থ-আলো বা দীপ্তি; মুস্তাফা জামান, *যশোরের লোকসাহিত্য*, *ছড়া*, *ধাঁধা*, *প্রবাদ-প্রবচন*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), ২৩৮।

৩৬ পারভেজ, সাক্ষাৎকার; আহম্মদ, সাক্ষাৎকার।

৩৭ *প্রাগুক্ত*।

৩৮ খায়ের, সাক্ষাৎকার।

৩৯ *প্রাগুক্ত*।

৪০ পারভেজ, সাক্ষাৎকার; ইসলাম, সাক্ষাৎকার।

৪১ চ্যাট অর্থ-অশ্লীলার্থক, প্যাট অর্থ- পেট; জামান, *যশোরের লোকসাহিত্য*, *ছড়া*, *ধাঁধা*, *প্রবাদ-প্রবচন*, *প্রাগুক্ত*, ২৪৮; আহম্মদ, সাক্ষাৎকার।

৪২ খায়ের, সাক্ষাৎকার; ইসলাম, সাক্ষাৎকার।

৪৩ পারভেজ, সাক্ষাৎকার।

৪৪ পারভেজ, সাক্ষাৎকার; খায়ের, সাক্ষাৎকার।

৪৫ ইসলাম, সাক্ষাৎকার; আহম্মদ, সাক্ষাৎকার।